দৈনিক সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্কট একশ্রেণীর শিক্ষকের ভূমি

এবার আর ছাত্র রাজনীতি এবং সেই রাজনীতিকেন্দ্রিক সন্ত্রাসের কারণে নয়, খোদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অতিমাত্রায় দলনির্ভর শিক্ষক রাজনীতির কারণে দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষা অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকরা উপাচার্যকে রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া আর কোন কাজ না করার 'নির্দেশ' দিয়েছেন। তারা উপাচার্যকে সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলসহ সব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক সভা করতেও বারণ করেছেন। স্পষ্টই মনে হচ্ছে, সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত বর্তমান উপাচার্যকে তারা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক লুৎফুর রহমান ইতোমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ওপর ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের চাপ বাড়ছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিরাপত্তার অভাবে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা সরকারপন্থী শিক্ষকদের ইন্ধনে ছাত্রদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড ভাঙচুর ও অপসারণের ঘটনায় শিক্ষকরা দলীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক অবস্থান থেকে দ্বিধাবিভক্ত। সেখানে চলছে উত্তেজনা। থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে। আমরা মনে করি, বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় কোন পক্ষ যদি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তরিত করতে চান তবে তারও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে। তা না করে একশ্রেণীর শিক্ষক বা চিকিৎসকের জবরদস্তি এবং রাতের অন্ধকারে মুখোশধারীদের সাইনবোর্ড অপসারণ কোন সভ্য পদ্ধতি নয়। কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যদি শিক্ষক রাজনীতিকে অতিমাত্রায় দল নির্ভর করে তোলেন, তাহলে সেখানে লেখাপড়ার সুস্থ পরিবেশ আর থাকে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির দাপটে শিক্ষার পরিবেশ এখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অবশ্য এমনটি যে এবারই প্রথম ঘটছে তা নয়। ইতোপূর্বেও কমবেশি একই ধরনের নেতিবাচক ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চত্বরে ঘটেছে। এটি যেন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই একটি অংশে পরিণত হয়ে গেছে। পরিতাপের বিষয়-ছাত্র রাজনীতির মতো শিক্ষক রাজনীতিও বর্তমানে রীতিমতো দল নির্ভর হয়ে গেছে। শিক্ষকরা কি তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাচ্ছেন? পত্রিকার প্রকাশিত খবর থেকেই জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগেরই ভিসি ও প্রো-ভিসির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি নিয়োগ গণতান্ত্রিকভাবেই নির্বাচিত প্যানেল ভিত্তিক হয়ে আসছে। সুতরাং সময় শেষ হবার আগেই পদত্যাগের জন্যে উপাচার্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ আইনের শাসনের পরিপন্থী। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরাই যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের তোয়াক্কা না করেন তা হলে ছাত্ররা কি শিখবে তাদের কাছ থেকে? আইনের শাসনও বা কোথায়? চূড়ান্ত বিচারে এ অবস্থা কি সিভিল সমাজের জন্যেও অশনি সংকেত নয়? বর্তমান উপাচার্য উপ-উপাচার্যদের সরিয়ে তাদের চেয়ার দখল করতে সাদা দলের 'দলনিয়র' শিক্ষক নেতারা বৈধ অবৈধ কোন পদ্ধতি অবলম্বনেই পিছ পা হচ্ছেন না। যাদের উচ্চাশা অত দূর পর্যন্ত যায়নি তারাও ডেপুটেশনে নিয়োগ পেতে পারেন এমন সব প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ওষুধ প্রশাসন, প্রেস ইন্সটিটিউট, বাংলা একাডেমী, শিক্ষা বোর্ড ও বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োগ পেতে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন। শ্রেণীকক্ষে জ্ঞানদান ছেড়ে তারা এখন ব্যস্ত মন্ত্রীপাড়ায় ও সচিবালয়ে তদবিরের কাজে। আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে এ ধরনের প্রবণতা প্রত্যাশা করতে পারি না। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের সামাজিক দায়িত্ব বিরাট। রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ আনুগত্যের রাজনীতি থেকে সরে এসে প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকাকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে নিলে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ফিরে আসবে, তেমনি শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদাও ক্ষুণ্ন থাকবে। আমরা এ কথা সব সময়ে সব আমলেই বলে আসছি। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এই পরিবেশ কোন পক্ষই যেন নস্যাৎ করতে না পারে।